নবম অধ্যায়
সমকালীন নাট্যকারদের সঙ্গে তুলনায় স্বতন্ত্রতা

''বন্ধু নিয়ে ঘর করেছি, অন্য কোন ঘর ছিল না—
একটা বটের পাতায় চেপে দশ জনেতে ভেসে গেছি।
হাল ছিল না, হাত বাড়ালে হাতের মধ্যে হাত পেয়েছি
করতালির শব্দে ভীষণ ঢেউগুলো সব ডুব দিয়েছে
যেন দশটা রাজার কাছে সমুদ্রটা ভয় পেয়েছে।
কারু কাঁধে হাত ছোঁয়ালে সত্যি সত্যি রাজা হতাম...''[১]

গণনাট্য থেকে বেরিয়ে এসে নাট্যকার, নির্দেশক, অভিনেতা ও অন্যান্য নাট্যকর্মী ও নাট্য ব্যক্তিত্বরা নতুন একটা নাট্য আন্দোলন জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এর ফলে শম্ভু মিত্রের নির্দেশে 'রক্তকরবী'র মতো যুগান্তকারী প্রযোজনা সম্ভব হয়েছিল। তবে তাঁরা গণনাট্য সংঘ প্রবর্তিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিজন ভট্টাচার্যের প্রযোজনা 'নবান্নে'র নতুন বিষয় ও নাট্যরীতিকে বিস্মৃত-প্রায় হয়েছিলেন। গণনাট্যের সংঘবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টা, উদ্যম ও শ্রেণিসংগ্রামের আদর্শের পরিবর্তে নবনাট্য আন্দোলনে ব্যক্তিগত প্রয়াস, মানবিকতার আদর্শ ও শিল্পের জন্য শিল্পের নীতি, রাজনৈতিক প্রচার ও স্লোগানহীনতা মুখ্য রূপে দেখা দেয়। পরবর্তীতে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সাড়া জাগানো কিছু করতে পারেননি। তুলসী লাহিড়ীও গ্রুপ থিয়েটারে নতুনত্ব আনতে পারেননি, মন্মথ রায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাটকও গণনাট্যে ততটা প্রযোজিত হয়নি। শেষ পর্যন্ত গ্রুপ থিয়েটারগুলি ইউরোপ-আমেরিকার নাটকের অনুবাদ, রূপান্তরের প্রচেষ্টা করে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু নবনাট্য আন্দোলন বাংলা থিয়েটারের সত্যিকারের ব্যাপক আন্দোলনের জন্ম দিতে না পারলেও নতুন নাট্যরীতি ও বিষয়ের জন্ম দিয়েছিল। গণনাট্যের আদর্শ বিচ্যুত হলেও পেশাদারি ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে নতুন শিল্প ও সমাজ চেতনা তাঁদের নাটকে দেখা গিয়েছিল। শিল্পের জন্য শিল্প করলেও সমসাময়িক সমাজ-রাজনৈতিক সংকট ও বাস্তবতা তাঁদের নাটকেও আসছিল। কিন্তু তা প্রোপাগাণ্ডা সুলভ ছিল না তাঁদের নাটকে। ব্যাপক নাট্য আন্দোলনের জন্ম দিতে না পারলেও তাঁরা আংশিক সফল হয়েছিলেন। রাজনৈতিক দলের সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এবং একটা নির্দিষ্ট আদর্শ থেকে বেরিয়ে আসায় তাঁদের কাছে নতুন শিল্পরীতি ও প্রযোজনা রীতি পাওয়ার আশা ছিল।

গণনাট্য থেকে বেরিয়ে আসায় নবনাট্য আন্দোলনকারীদের নিয়ে প্রচুর বিতর্কও তৈরি হয়েছিল। যেমন—

প্রথমত, নবনাট্য আন্দোলনকারীরা নাটককে বিশুদ্ধ শিল্প করে তোলার আশায় সমকালীন সমাজ-রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁরা নাটককে গণসংগ্রামের হাতিয়ার করার চেয়ে

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতাবাদী সাহিত্যাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন।

দ্বিতীয়ত, জনগণ থেকে সরে গিয়ে তাঁরা নতুন নাটকের দিকে হাত বাড়ালেন। যেভাবেই হোক নতুন কিছু করতে হবে। শিল্পকে শিল্প হয়ে উঠতে হবে। একটু উনিশ-বিশ হলে চলবে না। এ থেকে পরে সৎ নাট্যের জন্ম হয়। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে ওঠার চেষ্টায় নাটক শেষ পর্যন্ত জনগণের বাস্তব সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

তৃতীয়ত, নাট্য সমালোচক দর্শন চৌধুরী বলেছেন—

> "কায়েমী পুঁজিবাদী স্বার্থ তার এস্টাব্লিশমেন্টের সমস্ত পসরা নিয়ে এদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এল। প্রচারটা হলো এদের বেশি। খ্যাতি, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা অতি দ্রুত এদের করায়ত্ত হতে থাকল। শ্রেণীদ্বন্দ্বের নিরন্তর সংগ্রামে যে শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠায় গণনাট্য আন্দোলন তার নাটক ও বিষয়বস্তুকে নিয়োজিত করেছিল, নবনাট্য আন্দোলনের কর্মীরা তা থেকে সরে এসে অবক্ষয়ী সমাজের হতাশা, ব্যক্তিজীবনের ট্রাজেডি নাটকীয় কলা কৌশলের সূক্ষ্ম শিল্পের মাধ্যমে প্রচার করতে থাকলেন।"[২]

চতুর্থত, একদিকে পেশাদারি থিয়েটারগুলো ব্যবসায়িক, ধর্মীয়, পৌরাণিক, জাতীয় আবেগের চর্বিত চর্বণ করায় তাদের থিয়েটারে আর দর্শক সমাগম হচ্ছিল না। অন্যদিকে গণনাট্য সংঘের রাজনীতি, সংগ্রামী জীবন, প্রতিবাদ এবং অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ-লুণ্ঠনের মুখোশ খুলে দেওয়ায় ধনতান্ত্রিক শ্রেণি, প্রতিষ্ঠান ও স্বার্থান্বেষী সংবাদ মাধ্যম আনন্দিত হয়, ফলে তারা স্বাভাবিকভাবে নিজেদের স্বার্থে একটা নতুন নাট্য প্রচেষ্টাকে উৎসাহ ও প্রচার দিতে থাকে।

পঞ্চমত, মধ্যবিত্ত ব্যক্তিস্বার্থের এস্টাব্লিসমেন্টের একটা মোহ তাঁদের মধ্যে ছিল। নবনাট্য আন্দোলন বলা হলেও তাঁরা নাটকের জন্য নাটক করেছিলেন। ফলে তাদের পক্ষে প্রকৃত কোন আন্দোলনের জন্ম দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁদের নাট্য প্রযোজনা ছিল সম্পূর্ণ রূপে কলকাতাকেন্দ্রিক। কলকাতার বাইরে মফস্বল শহরে তাঁরা কখনো যেতেন না। ফলে তাঁদের প্রযোজনা সর্বস্তরের জনগণের কাছে ছিল অধরা।

ষষ্ঠত, গ্রুপ থিয়েটারের মধ্যে ভাঙন তখন ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। অনেক সমালোচক এর জন্য ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থান্বেষী প্রতিযোগিতাকে দায়ী করেছেন। ভাঙনের মূলে কোন আদর্শ ছিল না। গণনাট্য সংঘের সংঘবদ্ধতা তাদের মধ্যে কাজ করেনি। নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্তরা শিল্পের স্বার্থে, সুস্থ সংস্কৃতির স্বার্থে গ্রুপ থিয়েটারে যোগ দিলেও শ্রেণিসংগ্রামের কোন মহত্তর আদর্শ তাঁদের মধ্যে ছিল না।

সপ্তমত, নাট্যসমালোচক সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

> 'এরাই তো নাটকে আবার এনেছে পুরানো সেই পেশাদারী অভিনয় ধারা। নতুন বাচনভঙ্গী। স্বর প্রক্ষেপণের নবতর কারুকার্য্য কিংবা অভিনয়ে কোনও নব ডাইমেনশন কোথাও দেখি না। সবাই সেই পুরাতন কপিবুক থেকে ছিঁড়ে আনা দাগানো হরফ। সবাই সেই আবেগভিত্তিক

এক বুদ্ধিহীন অভিনয় ধারা। যেমন, সঙ্গীতের আবেগেই গান গেয়ে ওঠা যায়, গলা সাধা শুধু অপব্যয় সময়ের চিত্রাঙ্কনে নব আন্দোলন নতুন কৌশল আনে, রেখাঙ্কনের এক নতুন পদ্ধতি, বর্ণসুষমার এক নতুন কানুন। সাহিত্যের আন্দোলন সৃষ্টি করে নতুন শব্দের বাঁশি, সৃষ্টি করে অপূর্ব idiom। কই সেই আশ্চর্য idiom নবনাট্য নামধারী শৌখীন মঞ্চের ক্ষেত্রে।'[৩]

এর বিপরীতে সমালোচক দর্শন চৌধুরী বলেছেন, ''মূলত নাট্যবোধ এদের প্রবল ছিল বলে, এদের নাট্যপ্রচেষ্টা তদানীন্তন গতানুগতিক পেশাদারী নাট্যপ্রচেষ্টার থেকে সর্বদাই মুক্ত থাকার চেষ্টা করেছে। তথাকথিত ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও সামাজিক নাটকের যে চর্বিত চর্বন পেশাদারী মঞ্চগুলিতে চলছিল— নবনাট্যের কর্মীরা তাকে পরিত্যাগ করলেন। সমসাময়িক জীবনভাবনা, ধ্রুপদী নাট্যবিষয় ও নাটক, বিদেশী নাটক এরা নানাভাবে ও রূপে শুরু করলেন। বাংলা নাটকের বিষয়ের বিস্তার, অভিনয়ে উচ্চমান, প্রযোজনার সামগ্রিক খুঁটিনাটি নিয়ে চিন্তা এবং মঞ্চোপকরণের প্রতি শৈল্পিক নিষ্ঠা থাকার ফলেই এদের নাট্যপ্রযোজনা অতি সত্বর শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করল।''[৪]

এরপরেই বাংলা নাট্যজগতে উৎপল দত্ত, বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও মনোজ মিত্রের আবির্ভাব ঘটে। গণনাট্য আন্দোলনের ভাঙনের পর বাংলা মৌলিক নাট্যরচনা ও প্রযোজনার পর যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, এই চারজন নাট্যকারের অসামান্য মৌলিক প্রতিভার গুণে ও অক্লান্ত পরিশ্রমের জোরে খরাপ্রবণ বাংলা নাটকের রুক্ষ্ম ভূমিতে প্রবল বারিধারা ও বর্ষণের ফলে একের পর এক নতুন নাট্যফসলের জন্ম হতে থাকে। দ্বিজেন্দ্র-রসরাজ-রবীন্দ্র ও বিদেশী নাটকের প্রযোজনার পরিবর্তে বিষয় প্রকরণ-প্রযোজনার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় বাংলা নাট্যজগতে। প্রথমেই আলোচনা করা যেতে পারে উৎপল দত্তকে নিয়ে।

উৎপল দত্ত :

বিশিষ্ট নাট্যসমালোচক ও নাট্যব্যক্তিত্ব পবিত্র সরকারের মতে—

''... উৎপল দত্ত ছিলেন ব্রেশ্‌টের মতো এক তত্ত্ব ও আদর্শনিষ্ঠ নাট্যকার এবং পিস্‌কাটারের মতো এক দুর্ধর্ষ পরিচালক-প্রযোজক। কিন্তু এর বাইরেই থেকে যান বাংলা-হিন্দি এবং ক্বচিৎ ইংরেজি চলচ্চিত্র জগতের এবং বাংলা নাট্যজগতের এক মহাপরাক্রান্ত অভিনেতা উৎপল দত্ত, যে কৃতিত্বের দিকে ব্রেশ্‌ট বা পিসকাটার নিজেদের বিস্তারিত করেননি বললেই চলে, থেকে যান ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় মনস্বী গবেষক ও প্রবন্ধকার উৎপল দত্ত, থেকে যান তৃতীয় বিশ্বে নানান প্রতিকূলতার মধ্যে আধা-ঔপনিবেশিক কিছুটা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গড়ে ওঠা সাম্যবাদী আন্দোলনের সংগ্রামী সহচর উৎপল দত্ত, থেকে যান বহু ভাষাবিদ উৎপল দত্ত।''[৫]

১৯৫০ সালে বাংলার উত্তাল সমাজ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা থিয়েটারে উৎপল দত্তের

প্রবেশ। প্রথম জীবনে তিনি শেক্সপিয়র, বার্নাড শ', ক্লিফোর্ড অডেটসের নাটক অভিনয় করতেন। ইংরেজি নাটকে তেমন দর্শক সমাগম না হওয়ায় তিনি বাংলা নাটকে অভিনয় শুরু করেন। বাংলা নাটকে রাজনৈতিক নাটকের অভাব বোধ করায় তিনি নিজেই নাটক রচনায় ব্রতী হন। তাঁর জীবনের একমাত্র তপস্যা ছিল রাজনৈতিক নাটক রচনা এবং অভিনয় করা। তিনি মনে প্রাণে একজন বামপন্থী ছিলেন, মার্কসীয় রাজনীতিতে গভীর প্রত্যয়ী ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি আজীবন তাঁর নাটকে ঔপনিবেশিকতা, ধনতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করেছেন। ভারতের ধনবাদী বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার পতন ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত সেই মত ও পথের পথিক ছিলেন। তিনি নিজেকে শিল্পীর পরিবর্তে 'প্রোপাগান্ডিস্ট' হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি একবছর গণনাট্য সংঘেও ছিলেন। লিটিল থিয়েটার গ্রুপ, পিপলস থিয়েটার গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করে তিনি তাদের জন্য অজস্র নাটক রচনা, প্রযোজনা ও অভিনয় করেছিলেন। এছাড়া নিজের পরিচালিত যাত্রা সংগঠনগুলির জন্যও তিনি অজস্র নাটক রচনা করেছিলেন। তিনি প্রচুর পথনাটক রচনা, পরিচালনা ও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন সর্বহারার রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার ও প্রসারের জন্য।

যেহেতু তিনি মার্কসীয় আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তাই সেই মহান রাজনৈতিক বোধ থেকে কখনো জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াই, শ্রমিক শ্রেণির লড়াইকে নাটকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কখনো ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের লড়াই এবং ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের লড়াইকে অসামান্য জীবন্ত রূপ দিয়েছিলেন। মানুষকে গণ আন্দোলন ও বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত করেছিলেন রাষ্ট্র বিপ্লবের প্রয়োজনে। ইতিহাসের যে অংশে বৈপ্লবিক উপাদান ছিল, ইতিহাসে যেখানে দক্ষিণ-পন্থী রাজনৈতিক নেতারা জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, ইতিহাসে যেখানে বীর বিপ্লবী চরিত্র ছিল, তাই নাটকে বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন। নাট্য সমালোচক দর্শন চৌধুরী বলেছেন—

> "উৎপল দত্তের সমগ্র নাট্যজীবনের অগ্রগমণের মধ্যে মানুষের স্বপক্ষে থেকে তার মুক্তির দিশা দেখানোর কাজ বলেই মনে হয়েছে। উৎপল দত্ত বিশ্বাস করতেন— ইতিহাসের যে উপাদানের মধ্যে দাহিকাশক্তি আছে, তাকে উস্‌কে দিলে মানুষের মনের নির্বাপিত আগুন জ্বলে উঠবে।"[৬]

তিনি নাটককে অবসর বিনোদনের বিলাসী শিল্পকলা নয়, শোষিত মানুষের মুক্তির হাতিয়ার ভেবেছিলেন এবং নিজেকে তিনি সগর্বে পার্টিজান বলতেন। আর এই কারণে পৃথিবীর ইতিহাসে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি সম্পর্কে জানার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করেছিলেন।

পবিত্র সরকার বলেছেন— "... তীর, টোটা, কৃপাণ, রাইফেল, সন্ন্যাসীর তরবারি, টিনের তলোয়ার— নানান ধরনের অস্ত্রের নাম ব্যবহার করে এত বেশি নাটকের নামকরণ আর কোনো নাট্যকারই কি করেছেন? আর কোন নাট্যকারের নাটকে নানা ধরনের যুদ্ধ বিদ্যার অনুষঙ্গ— ফৌজ, ব্যারিকেড, দুর্গ— এত বেশি আছে?"[৭]

তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি হল— ‘অঙ্গার’, ‘ফেরারী ফৌজ’, ‘মানুষের অধিকারে’, ‘রাইফেল’, ‘ব্যারিকেড’, ‘টিনের তলোয়ার’, ‘কল্লোল’, ‘একলা চলো রে’, ‘জনতার আফিম’ ইত্যাদি।

শিল্প ও কলাকৌশল্যবাদীরা তাঁর নাটক সম্পর্কে প্রচার সর্বস্বতার অভিযোগ আনলে তিনি জবাবে বলেছিলেন—

> ‘‘হ্যাঁ আমি প্রচারক। কারণ আদর্শের প্রচার ছাড়া শিল্পের কী করণীয় থাকতে পারে আমি জানি না। যখন মুমূর্ষু বেড়ালের মতো নাটক ক্ষীণ কণ্ঠে বোঝাতে থাকে যে, পৃথিবীটা জঘন্য, অতএব অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার একমাত্র পথ আত্মহত্যা, মৃত্যু ছাড়া আত্মার মুক্তি নেই— তখন আপনারা কোনো প্রচারের গন্ধ পান না। নাটক হবে সমাজ দর্পণ— এই বস্তা পচা যুক্তির আড়ালে যখন কোনো নাটক সমাজের ডাস্টবিনটা শুধু খুঁচিয়ে ছেড়ে দেয়— তখন আপনারা কোনো উদ্দেশ্য খুঁজে পান না, কান চোখ বন্ধ করে ‘সৎশিল্পে’র ঢেকুর তোলেন, আর যখনই নাটক অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, সাধারণ মানুষকে প্রতিবাদের ভাষা জুগিয়ে দেয় তখনি সম্মিলিত হ্রেষায় আকাশ ফাটে, ‘এটা প্রচার’ ‘কমিউনিস্টদের প্রচার।’’[৮]

বাদল সরকার:

শম্ভুমিত্র, উৎপল দত্ত, বিজন ভট্টাচার্য, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে বাংলা নাটক যখন এগিয়ে চলছিল তখন বাদল সরকারের উত্থান; বাংলা নাটকের ইতিহাসে গণনাটক, নবনাটক বা সৎনাট্যের মতো একটি নতুন ধারার যখন শুরু হয়েছিল সেই সময়ে। ‘বড় পিসিমা’, ‘সলিউশন এক্স’, ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটক দিয়ে বাংলা নাটকের জগতে তাঁর পথ চলা শুরু হয়।

‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকটি সম্পর্কে মোহিত চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

> ‘‘মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা, মধ্যবিত্ত জীবনের একঘেয়েমি এবং তার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের অন্বেষা, যেটা ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’-এর মধ্যে দেখা গেছে অমল-বিমল- কমলদের মধ্যে থেকে একজন ইন্দ্রজিৎ উঠে আসবার যে তৃষ্ণা, এর মধ্য দিয়ে আমি মধ্যবিত্ত জীবনের মানুষ ছিলাম— সেই মধ্যবিত্ত জীবনের গভীর সত্যকে, গভীর বেদনাকে, গভীর স্বপ্নকে, গভীর আকাঙ্ক্ষা আকুলতাকে এমন একটা আঙ্গিকের মধ্যে পেলাম, যা আমাদের নাটকে, এককথায় বলব যে নতুন পথ খুলে দিল বলা যেতে পারে। নতুন সম্ভাবনা এনে দিল বলা যেতে পারে।’’[৯]

বাদল সরকার মোট ৫৭টি নাটক লিখেছিলেন। এরমধ্যে ২২টি নাটক লিখেছিলেন প্রসেনিয়াম মঞ্চের কথা মাথায় রেখে, বাকি নাটকগুলি তিনি অঙ্গন মঞ্চ এবং মাঠ মঞ্চের জন্য লিখেছিলেন। এছাড়া বেশকিছু নাটক তিনি রূপান্তর এবং ভাবানুবাদ করেছিলেন। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকটি ১৯৬৩ সালে রচিত হয়। ১৯৬৫ সালে বহুরূপী পত্রিকায় নাটকটি প্রকাশ হয়। নাটকটি বিষয় ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে

বাংলা থিয়েটারে আলোড়ন তৈরি করেছিল। ষাট-সত্তর দশকে বাংলা নাটকের গতানুগতিকতার স্রোতে এটি একটি ব্যতিক্রমী সংযোজন। বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের একঘেয়েমি জীবন নিয়ে এই নাটকটি লেখা। এছাড়া নাটকটিতে ক্যামুর 'মিথ অফ সিসিফাসে'র স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। ফলে নাটকের বিষয় এবং সংলাপও কিছুটা অ্যাবসার্ডধর্মী। এই নাটকটি পরবর্তীতে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কিমিতিবাদী নাটক রচনায় যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। তথ্যনির্ভর যুদ্ধবিরোধী একটি নাটকও তিনি লিখেছিলেন, তার নাম 'ত্রিংশ শতাব্দী'।

১৯৬৭ সালে তিনি নিজস্ব 'শতাব্দী' নামে নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'কবি কাহিনী' থেকে শুরু করে একে একে 'বাঘ', 'প্রলাপ', 'সারারাত্তির', 'শেষ নেই', 'বল্লভপুরের রূপকথা', 'সাগিনা মাহাতো', 'আবুহোসেন' প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করেন। এদের মধ্যে শেষ তিনটি নাটক জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিল।

নাটককে অর্থলাভের ব্যবসায়িক, স্বার্থান্বেষী, সঙ্কীর্ণ মানসিকতার ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত করার প্রয়াস করেছিলেন তিনি। নাটকের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছোতে চেয়েছিলেন, গ্রাম বাংলার মানুষকে জানতে চেয়েছিলেন তিনি। সেখানে অর্থ কোন বাঁধা হিসেবে দাঁড়াতে পারে না। অর্থের কোন কৃত্রিম বন্ধন থাকতে পারে না। তাই প্রসেনিয়াম মঞ্চ থেকে নাটককে তিনি মুক্ত করে এনেছিলেন অঙ্গন মঞ্চে। বাদল সরকারের বিশ্বাস—

> 'থিয়েটার মানুষের। সব মানুষের। সব মানুষের। সর্বসাধারণের... থিয়েটার পাড়ায়, হাটে, রাস্তায়। যেখানে মানুষ। সব মানুষ। ... থিয়েটার মানুষের কাজ। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগসূত্র। মানুষে মানুষে বন্ধন। ... থিয়েটার খোলামাঠ আর আকাশ। ... থিয়েটার সজীব প্রাণ। ... থিয়েটার জীবনের নগ্ন কঠিন চেতনা।'[১০]

এইভাবে থার্ড থিয়েটারের জন্ম হবে। অঙ্গন মঞ্চের রূপটি কেমন হবে সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

> ' সে রূপটি হোলো একটি ঘনিষ্ঠ থিয়েটারের, যেখানে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক দর্শক অভিনেতাদের খুব কাছে আছে, একই তলে আছে; যেখানে দর্শকদের সামনে ছাড়াও পাশে পিছনে যাওয়া যাচ্ছে, দর্শকদের চোখে চোখ রেখে একান্তে কথা বলা যাচ্ছে, দর্শকদের ধরা ছোঁয়ার আওতার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। এই রূপটির নাম দেওয়া যায় 'অঙ্গনমঞ্চ'।'[১১]

মনোজ মিত্র:

নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা সবক্ষেত্রেই মনোজ মিত্র তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। দীর্ঘ বা পূর্ণাঙ্গ নাটক বা স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাটক, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ সমকালীন সমস্যামূলক নাটক, চিরন্তন মূল্যবোধের নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, পৌরাণিক নাটক সর্বত্র তিনি বিচরণ করেছেন এবং নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

মনোজ মিত্র প্রায় একশোর বেশি নাটক লিখেছেন এবং নিজস্ব নাট্যদল চালনা, নির্দেশনা— নাটকে, চলচ্চিত্রে, সিনেমা, সিরিয়ালে নিয়মিত অভিনয়— সব মিলিয়ে এক বিস্ময়কর প্রতিভা যেন।

তাঁর নাটকগুলি ব্যবসায়িক দিক থেকেও চূড়ান্ত সফল হয়েছিল। তাঁর নাটকগুলি মূলত রাজনীতি মুক্ত অরাজনৈতিক গভীর মানবিক ও জীবনমুখী চেতনায় ভাস্বর।

তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি হল, 'মৃত্যুর চোখে জল', 'চাক ভাঙা মধু', 'সাজানো বাগান', 'রাজদর্শন', 'শোভাযাত্রা', 'নরকগুলজার', 'গল্প হেকিম সাহেব', 'কিনু কাহারের থিয়েটার' প্রভৃতি।

মনোজ মিত্রের নাটকগুলির মূল বৈশিষ্ট্য হল তিনি বক্তব্যহীনতার পরিবর্তে মানুষ ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক, মানুষের সম্পর্কের বিচ্ছেদ, ইতিহাসের দীর্ঘকাল ব্যাপী অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্বন্দ্ব-ঈর্ষা-ভালোবাসা-বিরহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি তাঁর নাটকে এসেছে মুখ্য রূপে। তাঁর প্রকাশভঙ্গিটি ছিল বাস্তব এবং রঙ্গব্যঙ্গ রসে ভরপুর। তাঁর বিদ্রোহ ছিল বক্তব্য- সর্বস্বতার বিরুদ্ধে। তার নাটকেও বক্তব্য এসেছে কিন্তু নাটকের চরিত্ররা সহজ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর ভারহীন বক্তব্য উচ্চারণ করতে পারে। তাঁর নাটকে কেরিকেচার আছে, প্যারডি আছে, এছাড়া উদ্ভট পরিস্থিতি ও কৌতুকময় সংলাপ আছে— সবমিলিয়ে পাঠককে এক নতুন জগতে নিয়ে যায় তাঁর নাটক। তিনি বলেছেন—

> "আমি এই মুহূর্তে একটি বিষয়কেই অধিকার দিয়ে লিখতে চাই, সেটা হল দীন মানুষ, দুর্বল মানুষ, অবহেলিত এবং পর্যুদস্ত মানুষ তার হীনতা, তার দুর্বলতা, তার ভয়, তার দ্বিধা সংশয় কাটিয়ে মানুষের মতো উঠে দাঁড়াচ্ছে। এ দেশের যে কোন ঘটনার মধ্যেই আমি এই মানুষকে খুঁজি, মানুষের এই সংগ্রামকেই ধরতে চাই।[১২]

নাটকে বক্তব্য সর্বস্বতার বিরুদ্ধে তিনি লিখেছিলেন—

> "নাট্যকারেরা হয়েছেন বক্তব্য কৈবল্যবাদী। মানুষ নিয়ে সাহিত্য, সেই মানুষই নাটক থেকে হারিয়ে গেছে। আলোছায়ায় ঘেরা গভীর গোপন মানুষ, অন্তর্লোকের বাসিন্দা মানুষ আমাদের ছেড়ে গেছে। আছে শুধু রূপহীন নিরাকার বক্তব্যের আদিম বস্তুপিণ্ড। চরিত্র নামক কয়েকটা মাউথপীসের মুখে সেই পিণ্ড ভাগ করে দিয়েই নাট্যকাররা কাজ সারতে পারেন। নাটক লেখার সহজ সরল একটা ছক তৈরি হয়েছে, কিছু উত্তাপ আর কিছু অভিশাপ নিয়ে বোনা, এক হাততালি পাওয়া ছক।"[১৩]

এই বক্তব্য সর্বস্বতা, প্রতিনিয়ত দায়িত্বপালন বাংলা নাটককে পরিশ্রান্ত, একঘেয়ে ও অস্বাভাবিক করে ফেলেছে বলে তিনি মনে করেন। যে বিষয়টা ছিল গর্বের, আনন্দের তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে অতিরিক্ত বোঝা স্বরূপ। পঞ্চাশের দশকের গণনাট্য সংঘের নাটকের উপর কনটেন্টের উপর বেশি চাপ পড়ায় তিনি আপত্তি জানিয়েছেন। এছাড়া কোন নাটকে বিশেষ ঘটনার দ্বারা সিদ্ধান্তে না আসা গেলেও সেখানে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়াটার তিনি প্রতিবাদ করেছেন।

মনোজ মিত্রের নাটকের কেন্দ্রে আছে মানুষ, বাস্তব মানুষ। আর এই মানুষের হাজারো দ্বন্দ্ব, জটিলতা, নীচতা-মহত্ব, ভালো-মন্দ, দোষ-গুণ, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ মিলে মিশে যে মানুষ, সেই মানুষের সহজ প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ততা— আর সহজ সরল ভঙ্গীতে তার প্রকাশ, আর এই কারণে তাঁর নাটকের

প্রকরণ আঙ্গিক ও সংলাপ মানুষকেন্দ্রিক। তাঁর নাটকে মানুষের জন্য বক্তব্য, বক্তব্যের জন্য মানুষ নয়।

তাঁর নাটকে মধ্যবিত্ত এসেছে তার শোষণ, যন্ত্রণা, বিচ্ছেদ, আনন্দ নিয়ে। সমাজে বাতিল হয়ে যাওয়া বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী মানুষও তাঁর নাটকে মুখ্য ভূমিকা নিয়ে এসেছে। নাট্যসমালোচক পবিত্র সরকার মনোজ মিত্রের নাটক সম্পর্কে বলেছেন—

> "মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা বা alienation মনোজের কাছে প্রিয় ও বেদনাময় একটি প্রসঙ্গ এবং এই বিচ্ছিন্নতার ছবিটি তীব্রভাবে ফুটিয়ে তুলেও তার বিরুদ্ধে এক ধরনের যুদ্ধ ঘোষণা করেন তিনি, আমাদের অবিশ্বাসী শূন্যের মধ্যে নিক্ষেপ না করে একটা কোনো আস্থা ও আশ্বাসে ফিরিয়ে আনতে চান। কখনও কখনও দু-একটি শারীরিক ও মানসিকভাবে পার্শ্বিক ও উৎকেন্দ্রিক চরিত্র সৃষ্টি করে এই বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি আরেকটু গভীরভাবে যেন তিনি বুঝতে চান। সেই জন্য তাঁর নাটকে বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ ও বিকলাঙ্গের আধিক্য দেখি। সেই সব marginalized মানুষজনের সমস্যা তিনি একটু বেশি খতিয়ে দেখেন, কারণ স্বাভাবিক, দৈনন্দিন মানুষকেই, স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র কন্যাকেই যেখানে বিচ্ছিন্নতার ক্ষয়রোগ এসে আক্রমণ করছে ...। মানিবকতার গভীর সূত্রেই তাঁর সমস্ত নাটকগুলি বাঁধা পড়ে। তাঁর সহানুভূতির বিস্তার দেখবার মতো।"[১৪]

মোহিত চট্টোপাধ্যায়:

উৎপল দত্ত, বাদল সরকার ও মনোজ মিত্রের তুলনায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক ছিল ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। সেই স্বতন্ত্রতাগুলি হল নিম্নরূপ—

i. মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণির নাগরিক মানুষ এসেছে। সমসময়ে তাঁর মতো নগর জীবনকে কেউ দেখাতে পারেননি। নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির শিক্ষিত মানুষের জীবনের নানা সংকট, বিপন্নতা, বিস্ময়, অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব, অস্তিত্বহীনতা, অ্যাবসার্ডিটি, প্রতিবাদ, প্রতিবাদহীনতা, সংগ্রাম ফুটে উঠেছে তাঁর নাটকে।

ii. তাঁর প্রথম পর্বের নাটকে ইউরোপ আমেরিকার আধুনিকোত্তর দর্শন যেভাবে তাঁর নাটকের চরিত্র, ঘটনা ও সংলাপের মধ্যে ফুটে উঠেছে, তা তাঁর সমকালে আর কোন বাঙালি নাট্যকারের নাটকে প্রকাশ পায়নি।

iii. বুদ্ধিদীপ্ত কাব্যিক সংলাপ, মননঋদ্ধ দার্শনিক চিন্তা এবং রূপ রীতির বৈচিত্র্যে তিনি অনন্যতা দেখিয়েছেন। তাঁর নাটকে চরিত্রদের সংলাপে অপূর্ব কাব্যিক শব্দচয়ন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্য সংলাপকে মনে করিয়ে দেয়। গদ্য পদ্য, কাব্য গদ্য, নাটক ও কাব্যের যৌথ সম্মিলন সমসাময়িক কালে আর কারও নাটকেই পাওয়া যায় না।

iv. তাঁর নাটকে বিষয়, নাটকের নামকরণ, নাটকের চরিত্রের আচার-আচরণ-সংলাপ উদ্ভট

ধরনের। যা বাংলা নাটকে ছিল অভিনব। ‘কণ্ঠনালীতে সূর্য’, ‘গন্ধরাজের হাততালি’, ‘চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড’, ‘মৃত্যুসংবাদ’ প্রভৃতি নামকরণে যেমন নতুনত্ব আছে, তেমনি নাটকের চরিত্রদের আচরণ ও উদ্দেশ্য ছিল উদ্ভট ধরনের। ‘কণ্ঠনালীতে সূর্য’ নাটকে অজ্ঞাত পরিচয় লোকটির কণ্ঠে সূর্য আটকে গিয়েছিল। ‘গন্ধরাজের হাততালি’ নাটকে হরিকিঙ্কর তলাপাত্র রাতের বেলা ঘুমানোর আগে নিজের শরীরের হাত, পা, মাথা সব এক এক করে খুলে রাখেন। ‘মৃত্যুসংবাদ’ নাটকে আগন্তুক লোকটি নিজের বাবাকে দার্শনিক কারণে হত্যা করতে চান।

v. বাস্তব ও ফ্যান্টাসি মেশানো চরিত্র দেখা যায় তাঁর নাটকে। তাঁর নাটকের চরিত্ররা অনায়াসে বাস্তব থেকে অবাস্তব ফ্যান্টাসি, পরাবাস্তব ও ম্যাজিক রিয়ালিটির জগতে বিচরণ করে।

vi. রিয়ালিজমের উর্দ্ধে উঠে ব্যক্তিগত-পারিবারিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক নানা সংকটের প্রকাশ ঘটিয়েছেন তিনি সূক্ষ্ম, অস্পষ্ট, সাংকেতিক, উদ্ভট, বিমূর্ত ও রহস্যগন্ধী রূপকের আড়ালে।

vii. বাস্তবাদী নাটক দেখতে অভ্যস্ত বাংলার নাট্যমোদী দর্শকদের প্রতি তিনিই প্রথম নন-রিয়ালিস্টিক নাটকের প্রতি আকর্ষণ তৈরি করেছিলেন। যদিও শুরুটা ছিল কণ্টকাকীর্ণ। এর জন্য তিনি অনেক সমালোচনাও সহ্য করেছিলেন। তাঁর বাস্তব বিরোধী নাটক দেখার জন্য প্রথমেই দর্শক প্রস্তুত ছিলেন না, ধীরে ধীরে দর্শকদের মধ্যে আকর্ষণ তৈরি হয়।

viii. তাঁর নাটকে কাব্যময় সংলাপ রচনার পিছনে কারণ ছিল, তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন কবি। কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারছিলেন না, তাই তিনি নাটক লেখা শুরু করেন। কিন্তু কবিতা লেখা ছেড়ে দিলেও তিনি কবিত্বকে ছাড়েননি। তাঁর অসাধারণ কাব্যবোধ ছিল। কবিতাকে তিনি নাটক রচনার উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়েছিলেন। কবিতার গভীরতা ও স্পর্শ তাঁর নাটকের নাট্যধর্ম ক্ষুণ্ণ করেনি বরং পাঠক ও দর্শকের মধ্যে আরও আকর্ষণ তৈরি করেছে।

ix. নাটক সাহিত্য নয়, তিনিই প্রথম নাটকের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে সেটা প্রমাণ করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন নাটক সাহিত্য নয়, মঞ্চের উপযোগী হয়ে উঠুক, সেই মতো নাটকের চরিত্ররা সংলাপ বা ভাষা আয়ত্ত করুক। সাহিত্য নয় নাটক হোক নাটকের মতো।

x. তাঁর নাটকের চরিত্ররা অ্যাবসার্ড বা কিমিতিবাদী জীবনকে তুলে ধরলেও শেষ পর্যন্ত মহত্তর কল্যাণবোধেই তাদের আস্থা থাকে। তাঁর নাটক থেকেই ‘কিমিতি’ শব্দটির জন্ম হয়। পরবর্তীতে কিমিতি শব্দটি ‘অ্যাবসার্ড’ শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

xi. তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের নাটকের চরিত্ররা ছিল অত্যন্ত রাজনীতি সচেতন। তাঁর প্রায় সমস্ত নাটকেই এই রাজনীতি সচেতনতা আমরা লক্ষ করি। পূর্ণাঙ্গ, একাঙ্ক, ছোট, অণু সমস্ত ধরনের নাটকেই পরোক্ষভাবে রাজনীতি এসেছে— সে রাজনীতি হল শোষকের বিরুদ্ধে শাসিতের রাজনীতি, অর্থলোভী, অত্যাচারী, অবক্ষয়ী, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের মানবতার রাজনীতি।

xii. রাজনীতি তাঁর নাটকের একটি প্রধান বিষয়। মার্কসীয় বামপন্থী রাজনৈতিক আদর্শের

প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর নাটকে। কিন্তু বাস্তবতা, স্লোগানধর্মীতা ও প্রচারধর্মীতাকে আশ্রয় করে তিনি বিপ্লবী রাজনৈতিক সচেতনতা ও আদর্শকে প্রকাশ করেননি। ননরিয়ালিস্টিক রূপক, সাংকেতিক, বিমূর্ততা, প্রতীক, ফ্যান্টাসি প্রভৃতিকে আশ্রয় করে রাজনৈতিক বিদ্রোহ, বিপ্লবী আদর্শের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর নাটকে। ফলে সমসাময়িকতা অতিক্রম করে চরিত্রগুলির আবেদন চিরন্তন মর্যাদা লাভ করেছে।

xiii. তিনিই প্রথম বাংলা থিয়েটারে অণুনাট্য আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিলেন। অণুনাটকের জন্য সভা, সমিতি, পদযাত্রা ও পত্রিকা প্রকাশে উৎসাহ দিয়েছিলেন। শ্রেষ্ঠ রাজনীতি সচেতন মানুষ হয়েও তিনি ছিলেন নাটকের জন্য নিবেদিত একজন ব্যক্তিত্ব। অণুনাটকের তত্ত্ব, সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে তিনি পূর্ণাঙ্গ, একাঙ্ক নাটকের মতো অণুনাটককেও বাংলা থিয়েটারে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

xiv. সারাজীবনে বড় ছোট মিলিয়ে প্রায় একশোটির বেশি নাটক লিখলেও তিনি কখনো নাটক নির্দেশনা করেননি। এদিক থেকে তিনি ছিলেন বাংলা থিয়েটারে ব্যতিক্রমী মানুষ। তাঁর নিজস্ব কোন নাট্যদল ছিল না, সমস্ত দলই তাঁর নাটক প্রযোজনা করেছিল এবং মঞ্চসাফল্যও পেয়েছিল। নিজস্ব নাট্যদল ছাড়াও তিনি নিজেকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বাংলা থিয়েটারে— যা তাঁর অসাধারণ প্রতিভার জোরেই সম্ভব হয়েছিল। তাই ছোট, বড় সমস্ত নাট্যদলের কাছেই তিনি ছিলেন শ্রদ্ধার মানুষ। তিনি ছিলেন—

> ‘‘থিয়েটারের নিখাদ আত্মজন, দলমত নির্বিশেষে নগন্য নাট্যকর্মীর সঙ্গেও ছিল যাঁর সুখ-দুঃখ-ভালোবাসার অকপট বাঁটোয়ারা।’’[১৫]

তথ্যসূত্র:

১. মোহিত চট্টোপাধ্যায়। বটের পাতা সেলাই হয় না। কবিতা সংগ্রহ। পুস্তক বিপণি। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ। ২৯ ভাদ্র ১৪০০। পৃ. ১৮৩।

২. দর্শন চৌধুরী। থিয়েটারে আন্দোলন। কলকাতা। গ্রুপ থিয়েটার ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা-শারদীয় ১৯৭৮। পৃ. ৩৮।

৩. সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। নব-নাট্য আন্দোলন— এ নামের শেষ হোক। বহুরূপী। কলকাতা। সম্পাদক-গঙ্গাপদ বসু। চতুর্দশ বিশেষ সংখ্যা। সেপ্টেম্বর, ১৯৬২।

৪. দর্শন চৌধুরী। থিয়েটারে আন্দোলন। কলকাতা। গ্রুপ থিয়েটার ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা-শারদীয় ১৯৭৮। পৃ. ৩৯।

৫. পবিত্র সরকার। ভূমিকা। উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র। প্রথম খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪০০। জানুয়ারি ১৯৯৪। পৃ. ৩।

৬. দর্শন চৌধুরী। থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত। কলকাতা। প্রথম সংস্করণ ২০০৭। পুস্তক বিপণি। কলকাতা। পৃ. ৩৩১।

৭. পবিত্র সরকার। ভূমিকা। উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র। প্রথম খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪০০। জানুয়ারি ১৯৯৪। পৃ. ৫।

৮. দর্শন চৌধুরী। থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত। কলকাতা। প্রথম সংস্করণ ২০০৭। পুস্তক বিপণি। কলকাতা। পৃ. ৩৩৮।

৯. বাদল স্মারক সংখ্যা। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি। প্রথম প্রকাশ ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪। পৃ. ১১৩

১০. বাদল স্মারক সংখ্যা। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি। প্রথম প্রকাশ ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪। পৃ. ১২০

১১. বাদল সরকার। থিয়েটারের ভাষা। নবগ্রন্থ কুটির। কার্তিক ১৩৯০। কলকাতা। পৃ. ৫৮।

১২. পবিত্র সরকার। ভূমিকা। উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র। প্রথম খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪০০। জানুয়ারি ১৯৯৪। পৃ. ৪।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

১৫. রঙ্গপট নাট্যপত্র, ২০১২, কলকাতা, মোহিত সঞ্চয়।